MESSAGE

CONVOCATION SPEAKER

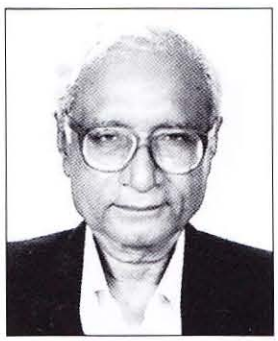

Professor AF Serajul Islam Choudhury
PROFESSOR EMERITUS
UNIVERSITY OF DHAKA

Message

It is indeed a great pleasure for me to learn that East West University is going to hold its 9th Convocation. I feel honored to be a part of this program as the Convocation Speaker.

I take this opportunity to extend my warm felicitations to the students who will be graduating successfully after years of hard work. I also congratulate the faculty members, officers and staff as well as guardians whose assistance and dedication have made this occasion possible. Education is given special emphasis universally but it is crucial for Bangladesh given its problems, scarcity of resources, and state of relative underdevelopment. I hope that graduating students will take note of this fact and hope that our national problems and aspirations will find a due place in their dreams and endeavors as they move on in life.

I wish this convocation every success and extend my best wishes to the graduating students for the future.

Professor AF Serajul Islam Choudhury

সমাবর্তন বক্তৃতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য চ্যান্সেলার, সম্মানীয় ভাইস-চ্যান্সেলার, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, ডীন, শিক্ষকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং সমাবর্তনে যাঁরা সনদ পাচ্ছে সেই শিক্ষার্থীবৃন্দ,
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তনের আনন্দোজ্জ্বল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সেই সঙ্গে গর্বিতও।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি নবম সমাবর্তন। সন্দেহ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয় এগুচ্ছে। এই অগ্রগতি অবকাঠামোগত পরিসর, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা, শিক্ষার মান, সবদিক দিয়েই ঘটছে। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের যে সুযোগ ঘটেছে তাতে আমি এই অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত; তবে আমার চেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক বেশি জানেন যাঁরা নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে তার এই অগ্রযাত্রায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সমাবর্তনে যে আনন্দ ও মিলন ঘটে তার কেন্দ্রে থাকে সনদ নিয়ে যে স্নাতকেরা বের হয়ে যাচ্ছে তারা। তাদের সকলের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন, আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছি এবং যাঁরা এখানে নেই তবু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন, তাঁদের সকলেরই হৃদয়উপচানো শুভেচ্ছা থাকবে।

একদিন এই শিক্ষার্থীরা বুকভরা আশা নিয়ে এখানে এসেছিল, আজ যখন তারা অনিশ্চিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তখন সেই আশার সঙ্গে ভরসাও নিশ্চয়ই যুক্ত হয়েছে। তারা সমৃদ্ধ হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, এই সমৃদ্ধি যেমন জ্ঞানের তেমনি সামাজিকতারও। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি, আহরণ ও বিতরণের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেই কর্তব্যপালনই তার একমাত্র দায়িত্ব নয়, বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিকতারও শিক্ষা দেয়। স্নাতকেরা যে জ্ঞান এখান থেকে সংগ্রহ করেছে, কর্মক্ষেত্রে তা পরীক্ষিত হবে। কোনো জ্ঞানই আসলে জ্ঞান নয় যদি তা পরীক্ষিত না হয়। নতুন নতুন দ্বন্দ্ব ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে এই স্নাতকেরা যে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দেবে সে ভরসা আমাদের আছে। কিন্তু আমরা এটাও আশা করবো যে তারা সামাজিক মানুষও হবে; তাদের মধ্যে থাকবে সহমর্মিতা,

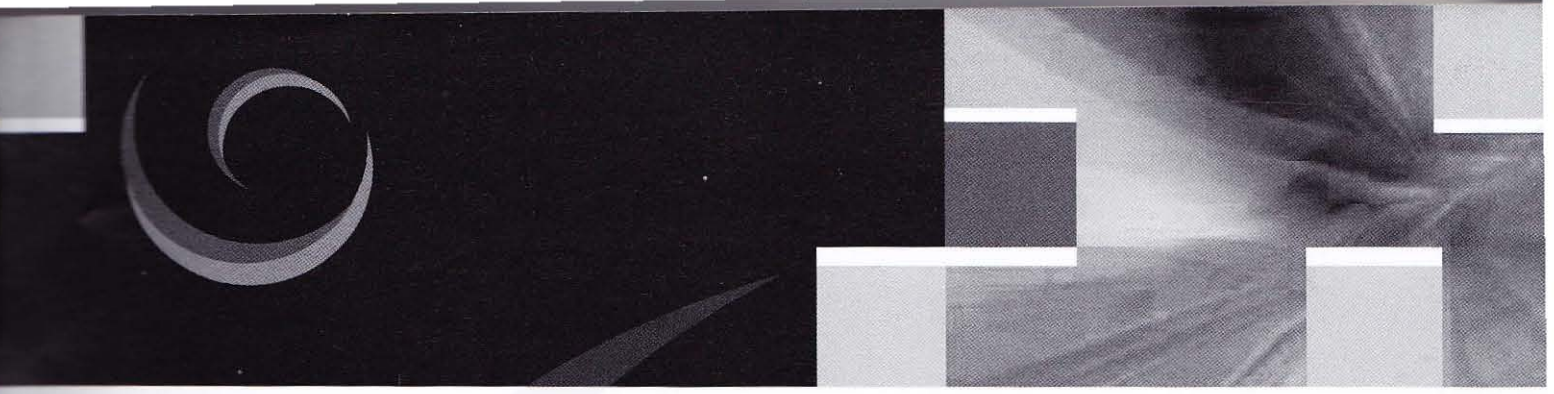

সংবেদনশীলতা, বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার আগ্রহ। আমরা চাইবো তারা দৃষ্টান্ত হবে যেমন দক্ষতায় তেমনি সামাজিকতায়। ফলে তারা নিজেরা গৌরবান্বিত হবে, এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কেও নতুন নতুন গৌরব এনে দেবে। তারা যেমন নিয়েছে, তেমনি দেবেও। দেবে যে তা কেবল কৃতজ্ঞতার বোধ থেকে নয়, অন্তর্গত অনুপ্রেরণাতেও।

ওই অনুপ্রেরণাটা খুব জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা যে গৌরব এনে দেবে তাতে উজ্জ্বলতা বাড়বে সারা দেশের। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যে খুব উজ্জ্বল এমনটা বলার উপায় নেই। উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির দায়িত্ব মূলত শিক্ষিত মানুষদেরই। কিন্তু একা বড় হলে দেশের গৌরব যে বাড়বে তা কিন্তু নয়। পঙ্কে পদ্ম ফোটে, তাতে পদ্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পঙ্ক পঙ্কই রয়ে যায়। আমরা পঙ্কে প্রস্ফুটিত কয়েকটি পদ্মফুল চাই না, চাই বাগানভর্তি অনেক ফুল, বহু রকমের বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের, যাতে প্রতিটি ফুলের সঙ্গে মিলে বাগানের নিজেরও গৌরব বাড়বে।

উপমাটা বদলেও দেওয়া যায়। দেওয়াটাই বোধ করি সঙ্গত; বলতে পারি যে ফুল নয় আমরা বরঞ্চ ঝরণাধারা চাই, যা কেবল যে সুন্দর তা নয়, উপকারী হবে বৈকি। নির্ঝরের আজ বড় দরকার। প্রকৃতিতে যেমন নদী ও জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে, ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা আসছে কমে, সমাজেও তেমনি শুষ্কতা ও অনুর্বরতা দেখা দিয়েছে, এবং আমরা মানুষেরাও শুষ্ক, সংবেদনতাহীন ও উৎপাটিত হয়ে পড়ছি। কেবল জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষেই কুলাবে না, সংবেদনশীল ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ চাই। শিক্ষিত জনের কাছ থেকেই সেটা প্রত্যাশিত, তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এমনটাই আমরা আশা করি। কিন্তু তেমনটা যে ঘটছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে যে অনুসরণীয় মানুষ পাওয়া যাচ্ছে তেমন কথা বলার উপায় নেই, যে জন্য আমাদের দৈন্য ঘুঁচছে না, ভাঙাচোরা ভাবমূর্তিটি ক্রমাগত ম্লান হয়ে আসছে।

সমাজ থেকে প্রতিনিয়ত আমরা নিচ্ছি, সমাজই আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশ ও উন্নতিকে সম্ভব করে তুলছে; কিন্তু প্রশ্নটা তো থাকে যে সমাজকে আমরা কি দিচ্ছি? সমাজ থেকে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে দিতেও হবে, নইলে তো আমরা প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারবো না, কেননা মনুষ্যত্ব ওই দেওয়া-নেওয়া, ওই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই অনুশীলিত হয়। কাজটা যে ঋণ কিংবা দায়িত্ববোধ থেকেই করতে হবে তা নয়, ঋণ ও দায়িত্ব তো আছেই, মূল অনুপ্রেরণাটা আসবে অন্তর্গত মনুষ্যত্বের তাগিদেই। এবং যা দেবো তা ফেরতও পাবো, সমাজ কোনো কিছুই আত্মসাৎ করে না, ধরে রাখে, ফিরিয়ে দেয়। সমাজ যদি সুন্দর হয় সে সৌন্দর্য ব্যক্তিপর্যায়ে আমাদের কাছে চলে আসবে, কেননা আমাদের সকলকে নিয়েই তো সমাজ, সে তো নিরাবয়ব ধারণা মাত্র নয়, সে একটি বাস্তবতা।

কিন্তু সমাজকে আমরা কি দেব? একত্র হয়ে আমরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দানখয়রাত করাও অসম্ভব নয়, আমরা অন্যদেরকে উন্নতি করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি। এসব কাজের মূল্য আছে বৈকি, কিন্তু এদের কোনটাই পর্যাপ্ত নয়। সমাজসেবা, সমাজসংস্কার, এসব ভালো কাজ, কিন্তু বাংলাদেশে যা প্রয়োজন তা হলো একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলা। যে সমাজে আমরা বসবাস করি সেটা মোটেই মানবিক নয়। এখানে প্রধান সত্য হচ্ছে বৈষম্য। বৈষম্য ধনী গরিবে, নারী পুরুষে, গ্রামে ও শহরে।

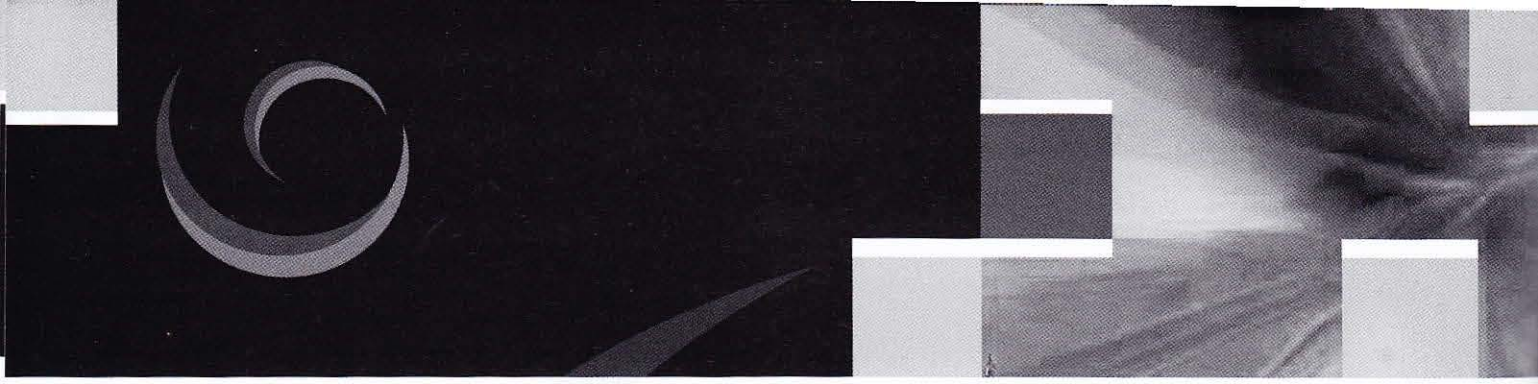

প্রবল এখানে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, দুর্বল উৎপাটিত হয়, হারিয়ে যায়; শিশু ও বৃদ্ধরা এখানে লাঞ্ছিত হয়। আমরা মুক্তির স্বপ্ন দেখেছি, তার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি, কিন্তু মুক্তি আসেনি। না-আসার কারণ হলো সমাজ সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। এই সমাজকে ভাঙতে হবে, ভাঙার প্রয়োজনে নয়, গড়ার প্রয়োজনে। আর ভাঙার উপায়টা যে বাইরে থেকে তাকে আঘাত করা তা নয়, উপায় হচ্ছে ভেতর থেকে নতুন একটা সমাজ গড়ে তোলা। সেই সমাজে মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য থাকবে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে, এবং সকল পর্যায়ে যথার্থ জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই কাজটা প্রধানত রাজনীতির। কিন্তু রাজনীতিকরা একাজ করছেন না। দায়িত্ব নিতে হবে তাই শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক মানুষদেরকেই। প্রেম ভালোবাসার কথা খুব শোনা যায়, তার নামে অনাচারও চলে, কিন্তু যার অভাব সেটা হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ক্রমাগত কমছে। কমে যাবার প্রধান কারণ ওই বৈষম্য। এখানে যারা সুযোগপ্রাপ্ত তাঁরা নিজেদের কথাই ভাবে, দেশের মানুষের কথা ভুলে গিয়ে, এবং দেশের মানুষের সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে, কুৎসিৎরূপে সত্য হয়ে ওঠে আত্মপ্রেম।

সমাজ পরিবর্তনের জন্য দেশপ্রেমিকদের ঐক্য চাই। কাজটা তাঁরা রাজনৈতিক ভাবে করবেন, করতে পারেন সাংস্কৃতিক ভাবেও। এই সাংস্কৃতিভাবে করাটা কিন্তু কম জরুরী নয়। সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাতৃভাষার চর্চা করা। মাতৃভাষার চর্চার ভেতর দিয়েই আমরা সামাজিক ও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারি, যুক্ত হতে পারি অন্য মানুষদের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিবেশের সঙ্গেও। বাংলা বই পড়া, বই পড়তে অন্যদেরকে উৎসাহিত করা, বই লেখা এবং গ্রন্থাগার গড়ার আন্দোলনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। সঙ্গীত, নাটক, আলোচনা, নৃত্য, চিত্রকলা সবকিছুই চর্চা প্রয়োজন ও সম্ভব। এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য গড়ে তোলা যাবে, যার ফলে ভেতর থেকে নতুন একটি সমাজই গড়ে উঠবে। রাষ্ট্র বাধা দেবে, কিন্তু সফল হবে না।

আমরা স্বপ্নের কথা বলি; স্বপ্ন তো খুবই প্রয়োজন, নইলে আমরা বাঁচবো কী করে, কিন্তু স্বপ্নের চেয়েও বেশি দরকার গন্তব্যের। স্বপ্ন দেখা সহজ, গন্তব্য স্থির করে সেখানে পৌঁছাটা কঠিন। গন্তব্যটা হচ্ছে নতুন সমাজগড়া। ওই গন্তব্যে একা পৌঁছানো যাবে না, যায়নি কখনো, যেতে হবে সকলের সঙ্গে মিলে, ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে, যেমন ঐক্য একাত্তরে দেখা গেছে, দেখা গেছে অন্যান্য আন্দোলনেও। কিন্তু ঐক্য তো টেকেনি, কেননা আমরা সমবেত ও ধারাবাহিকভাবে এগুতে পারিনি, ব্যক্তিস্বার্থের আঘাতে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছি, একের ওপর অন্যের আস্থা নেই। নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যটাকে সামনে রাখা চাই, তাতে স্বপ্ন থাকবে, কিন্তু স্বপ্নটা ব্যক্তিগত নয়, অলীকও নয়, সেটি হবে সমষ্টিগত ও বাস্তবিক।

আকাশ সত্য, সমুদ্রও সত্য। কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আকাশ আমাদেরকে উদার হতে শেখায়, স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে, আকাশকুসুম রচনা আমরা অনায়াসেই করতে পারি, করেও থাকি। কিন্তু সমুদ্রে কাজটা ভিন্ন রকমের, সেখানে যেতে হলে সাহস চাই, জাহাজ দরকার হয়, মোকাবিলা করতে হয় ঝড়ঝঞ্ঝার, এমনকি জলদস্যুরও। সমুদ্রের শিক্ষাটা

হচ্ছে গভীর হওয়ার। আমরা আকাশচারী যতটা হয়েছি, সমুদ্রের দিকে ততটা তাকাইনি। ফলে আমাদের নিজেদের যে সমুদ্র, কল্পনার নয়, বাস্তবের, সেই বঙ্গোপসাগর আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর কেবল আমরাই-বা কেন, ধনী বিশ্বও তো আকাশপথে ছোটাছুটি করেছে, আকাশ নিয়ে গবেষণায় ও গ্রহ-উপগ্রহে গমণাগমণে যত অর্থ ব্যয় করেছে সমুদ্রের ব্যাপারে তার ভগ্নাংশও ব্যয় করেনি, বরঞ্চ সমুদ্রকে তারা নানাভাবে উত্ত্যক্ত ও দূষিত করেছে, যার ফলে সমুদ্র এখন ফুসে উঠছে, অনেক নিম্নভূমিকেই ডুবিয়ে দেবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য সমুদ্রকে উপেক্ষা করার ফলে মালিকানা হারানোর সঙ্কট তো দেখা দিয়েছেই, সমুদ্রযাত্রা সে সাহস, গভীরতা ও সম্পদ নিয়ে আসতে পারে তাও পাওয়া যায় নি। আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। আমাদের পক্ষে কেবল আকাশনির্ভর হলে চলবে না, সমুদ্রনির্ভরও হওয়া চাই, এবং এটা ভুললে মারাত্মক ক্ষতি হবে যে বাংলাদেশ কেবল নদীমাতৃক নয়, সমুদ্রমাতৃকও বটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিপদ আমাদের জন্য আতঙ্ক হয়ে দেখা দিচ্ছে তার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে জানানোর কাজে আমরা যত না উদ্যোগী হতে পেরেছি বিশ্বের বিজ্ঞানী ও পরিবেশসচেতন মানুষদের উদ্যোগটা তার চেয়ে বেশি। বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণের ব্যাপারে ধনী দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা একটি বড় মাপের দেশপ্রেমিক কর্তব্য। বাংলাদেশেরই সে-কাজে নেতৃত্বদান করবার কথা। সেটা সে দেবেও, যদি শিক্ষিত দেশপ্রেমিকেরা এগিয়ে আসেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি আশঙ্কাজনক সত্যের কথা স্মরণ করা যাক। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে; উচ্চতর পর্যায়ে মানববিদ্যার চর্চাও কমতির দিকে, বিজ্ঞানমনস্কতাও নিম্নগামী; শিক্ষার হার বাড়ছে অথচ বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার চর্চা বাড়ছে না এটা মোটেই ভালো খবর নয়। বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য অপরিহার্য বৈকি।

এই সমাবেশে আমার কাজ উপদেশ দেওয়া নয়, প্রধান কাজ স্নাতকদের অভিনন্দন জানানো এবং পরবর্তী জীবনে তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করা; সেই কাজটা করার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি, আর এই যে অতিরিক্ত কথাগুলো বললাম তা ওই দায়িত্বপালনের অংশ হিসেবে, তার বাইরে নয়। তাদের জয় হোক।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা আমাকে এই কাজটি করার সুযোগ দানের জন্য।